রবীন্দ্রগানে পাঠভেদ

সুভাষ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের গানের পাঠভেদের পরিমাণ নির্ধারণ করা বড়ো সহজসাধ্য নয়— আজ আর এ কথা আমাদের অজানা নেই। তবে অনুমান করতে খুব অসুবিধা হয় না। কখনো একই গানের ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় শব্দের বদল, কখনো বা সম্পূর্ণ ছত্রেরও বদল ঘটিয়েছেন। আবার কখনো বা গানটির রূপ নিয়েছে— যে-রূপের সঙ্গে তার প্রাথমিক রূপের অন্তঃশীল একটি স্রোতের সন্ধান মেলে কিন্তু বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন। এমন গানও চোখে পড়েছে যার রচনার কোনো নির্দিষ্ট তারিখের সন্ধান মেলে নি। আবার একই গানের কোনো কোনো পাঠের সঙ্গে তারিখ দেওয়া আছে। তবে কি নির্দিষ্ট গানটি প্রথমে রচিত হয়েছিল কবিতা হিসেবে, পরে তা পরিমার্জনের ফলে গানের রূপ নিল? এ প্রসঙ্গেও মনে জাগে— তবে কি সেই কবিতার সুর ও ছন্দের প্রয়োগে বাণী বিন্যাসের বদল ঘটেছে? না কি সেই-সব কবিতাগুলির গীতধর্মিতার ঘাটতি বা কোনো ফাঁক ছিল বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এখন আর কে এই-সব প্রশ্নের উত্তর দেবে? আবার এ কথা সকলেরই জানা আছে, অনেক ক্ষেত্রে অনুমান করে নিতে হয়, আবার তার পিছনে নির্দিষ্ট একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের সন্ধান করতে সচেষ্ট হতে হয়। পূর্বরচিত একটি গান যখন পরবর্তী সময়ে নাটকে বা নৃত্যনাট্যে ব্যবহার করেছেন, তখন বাণীর হেরফের ঘটিয়েছেন যা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একবার একই গানের সম্পূর্ণ নতুন সুর দিতে বাধ্য হওয়ার দু-একটি শব্দের বদল ঘটিয়েছেন। কী আশ্চর্য ধৈর্য আর সৃষ্টির প্রতি তাঁর মমত্ব দেখলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এখানে ধরা থাকল সামান্য কয়েকটি নিদর্শন যা থেকে তাঁর সংগীত সৃষ্টির প্রতি প্রত্যয় আর সৌন্দর্যবোধের সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হয়।—

১. গীতবিতান কেন আর মিথ্যে আশা বারে বারে।

ওরে তোর সঙ্গে যে কেউ যাবে না রে।।
এ তোমার রাত্রিশেষের ভোরের পাখি,
তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি;
যা রে তুই বিজন পথে চলে যা রে।।
ওদের ওই হৃদয়কুঁড়ি শিশির-রাতে।
বসে রয় চোখের জলের অপেক্ষাতে।।
মেটাতে পারবে না তো আঁধার নিশা
তোমার এই ফোটা ফুলের আলোর তৃষা,
সে যে তাই চেয়ে আছে পুবের পারে।।

রচনা ১৭ই ভাদ্র
সুল/সকাল
১৩২১

পাণ্ডুলিপি ঃ

পাণ্ডুলিপির পাঠে কেবল প্রথম ছত্রে কেন আর মিথ্যা আশা বারে বারে।

‘গীতালি’র ২৩-সংখ্যক গান—

যে থাকে থাক্-না দ্বারে,

যে যাবি যা না পারে।
যদি ওই ভোরের পাখি
তোরি নাম যায় রে ডাকি,
একা তুই চলে যা রে।।
কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।
ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তার আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে।।

—এর রচনা তারিখ একই— গান দুটির সুর কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'পল্লীবাণী' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩২৬-গানটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত স্বরলিপি সহ এই পূর্বপাঠ প্রকাশের পর তার সন্ধান পাওয়া যায় লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে।

তা হলে কি গীতালির এই পূর্বপাঠটি ('কেন আর মিথ্যে আশা') রচনা ও সুর-সংযোজনাতেও তিনি তৃপ্ত ছিলেন না? তাই কি একই দিনে প্রায় নতুন করে রচনা ও সুর যোজনায় তৃপ্ত হলেন?

২. গীতবিতান বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জ্বালা।।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে মিছে রে ওই কেঁদে মরে—
মরণ এবার আনল আমার বরণডালা।।
যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ-পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা—
আরাম বলে 'এল আমার যাবার পালা।'

রচনা ফাল্গুন ১৩২১ কবিকৃত বদলের দৃষ্টান্ত সহ গীতিবিতানের সেই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি-চিত্র

গীতবিতান বইটির ৫৩২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এই গানটির

"পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার" আন্‌লো আমার
বরণডালা।।

-এর পাশে কবির হস্তাক্ষরে শব্দ বদলের দৃষ্টান্ত

"পিছের বাঁধন রৈল পিছে
চেনা ভুবন হোলো মিছে
পথের বধূ" আন্‌লো আমার
বরণডালা।।

আর শেষে— "কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌লো নেশা,
আরাম বলে, "এলো আমার
যাবার পালা!"

-এর পাশে লিখলেন

"যাত্রা আমার নির্দ্দেশা

পথ হারাবার লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার" আমার
যাবার পালা!

যদিও কবি-চিহ্নিত বদলগুলি
'বসন্তে ফুল গাঁথল...' গানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি।
এই গানটির সঙ্গে তুলনীয়, 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের (বৈশাখ ১৪৪৩)
"অশান্তি আজ হানল এ কী দহন জ্বালা" গানের
শেষ চার ছত্রে কবির হস্তাক্ষরের দ্বিতীয় অংশ
"যাত্রা আমার 'নিদ্দেশ... যাবার পালা" ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।
কিন্তু কবির হস্তাক্ষরের প্রথম বদলের ব্যবহারের কোনো হদিশ পাওয়া যায় না— কোথাও ব্যবহার হয়েছে কি?

৩. গীতবিতান দোলে দোলেৰ দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয়-আকাশে,

দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা সে।।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের পারে
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে।।
দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে
আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে।।
১৫ ফাল্গুন ১৩৩২

গানটির পাণ্ডুলিপির শিরোদেশে লেখা "আশীর্ব্বাদ/বাব্‌লিকে"। একই গানের অন্য পাণ্ডুলিপির শিরোদেশে লেখা "বাব্‌লিকে", শিরোদেশের 'বাব্‌লি' রেবা মহলানবিশ (সুশোভন সরকারের স্ত্রী)। দুটি পাণ্ডুলিপির পাঠের যেমন তফাত আছে, গীতবিতান ও বৈকালীর (১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) পাঠ অভিন্ন, কেবল গীতবিতানে স্বরবিতান অনুযায়ী প্রথমে 'দোলে দোলে' মুদ্রিত। এই দুই গ্রন্থের পাঠের সঙ্গেও পাণ্ডুলিপির পাঠের তফাত দেখা যায়।
পাণ্ডুলিপিদুটি মুদ্রিত হল

৪. গীতবিতান ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।।
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।।
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে।।
১৫ ফাল্গুন ১৩৩২

বৈকালী, সংখ্যা ২, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ কবির হস্তাক্ষর মুদ্রিত সংযোজন ও পাঠান্তর
নতুন ছত্র ৫ মধুর বসন্তে
ছত্র ৬ রাঙালো রাঙায়
ছত্র ৭ কলিগুলি ফুলধূলি

ছত্র ৮ বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে
নতুন ছত্র এঁকে দিল তোমার সীমন্তে
নতুন ছত্র ৯ মধুর বসন্তে।

গানটির একই দিনের (১৫ ফাল্গুন/১৩৩২) একই জনের উদ্দেশে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে (“কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেবাকে/আশীর্ব্বাদ”, পূর্বের কবিতা দুটিতে মুদ্রিত “বাবলি”— এঁরই ডাকনাম) পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। কবিতাগুলির তারিখ ও অন্যান্য বিষয়ে দ্রষ্টব্য ‘বৈকালী’ (৩২ আষাঢ় ১৩৮১ ১৭ জুলাই ১৯৭৪) গ্রন্থে কানাই সামন্ত -লিখিত গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৯৯-১০০, ১০৬।

একটি পাণ্ডুলিপি ।। এখানে গানটিতে ১২ ছত্র
অন্য পাণ্ডুলিপি ।। এখানে গানটিতে ১০ ছত্র

৫. গীতবিতান

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা—
আন্‌মনা যেন দিক্‌বালিকার ভাসানো মেঘের ভেলা।
যেমন হেলায় অলস ছন্দে কোন্ খেয়ালির কোন্ আনন্দে
সকালে ধরানো আমের মুকুল ঝরানো বিকালবেলা।
যে বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ, ভুলে যায় দিনশেষে,
তার হাতে দিই আমার ছন্দ— কোথা যায় কে জানে সে।
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায় জেনো জেনো মোর সকলই হারায়,
চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা।
১৫ ফাল্গুন ১৩৩২

পাদন্ডুলিপিতেঃ

পাণ্ডুলিপিতে পাঠের অনেক তফাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়— রচনা তারিখ একই দেখা যায় — গীতধর্মিতার কারণেই কি গানের মুদ্রিত পাঠে বদল করেছেন?

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com